Website: https://www.parthasarathipatrika.com

২৫ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

১০ই বৈশাখ, ১৪২৯ / 24.04.2022

-: সম্পাদক:-

সুনন্দা ঘোষ

DO NOT COPY

## -: সূচীপত্র :-


| | |
|---|---|
| প্রীতি-কণা | শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ |
| স্মৃতিচারণ | শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ |
| অল্পচিন্তা | শ্রী অরবিন্দ |
| স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশানুরাগ | ইন্দিরা গঙ্গোপাধ্যায় |
| ভক্ত-বৎসল শ্রীচৈতন্য | ডাঃ রুহিদাস সাহা |
| তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের অলৌকিকত্ব | ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য |
| পাসওয়ার্ড | শ্রী দীপঙ্কর নন্দী |
| মনের পূজা | স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ |
| পিতা নো বোধি | শ্রী সুনন্দন ঘোষ |
| আমাদের কথা | সম্পাদক |


DO NOT COPY

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by
Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.
Website: https://www.parthasarathipatrika.com
Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

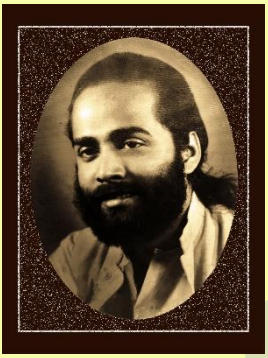

**(10.03.1926 - 24.11.1986)**

## প্রীতি-কণা

"আমাদের ব্যক্তিগত আরাম, পরিতৃপ্তি, ভোগ অথবা আনন্দ অনুসন্ধানের সকল প্রয়াস ত্যাগ করতে হবে। জীবনে পরমকে পাবার জন্য এক জ্বলন্ত শিখা হয়ে যাও। যা কিছু তোমার জীবনে ঘটছে তা সবই তোমার উন্নতির সহায়ক রূপে মেনে নাও এবং তোমার জীবনের উন্নতি সাধনের চেষ্টা কর।

যে কাজই তুমি করছ তা সব আনন্দের সাথে কর। কিন্তু সুখের প্রলোভনে কোন কাজ করো না। কখনো উত্তেজিত হয়ো না। হৃদয় দৌর্বল্য প্রকাশ করো না বা বিক্ষুব্ধ হয়ো না। যা কিছু ঘটুক না কেন সর্বতোভাবে শান্ত ও স্থির হয়ে থেকো। সর্বদা সচেতন হয়ে থাকতে হবে যে উন্নতি তোমায় করতে হবে সে সম্বন্ধে এবং কালক্ষেপ না করে সেই উন্নতি করতে হবে। বাইরের জগতে যা ঘটছে, বাহির দেখেই তা বিচার করা ঠিক নয়। তারা হল অন্য একটা কিছু প্রকাশের অনিপুণ প্রয়াস মাত্র। তারা প্রকাশ করতে চায় একটি সত্য বস্তু যা তোমার বাহ্যিক বোধশক্তি ধরতে পারছে না। কারও ব্যবহারে কোনদিন বিক্ষোভ প্রকাশ করো না। তাদের প্রকৃতিতে এমন একটা কিছু আছে যা তাদের এমন সব কাজ করাচ্ছে। তোমার সাধ্য ও সাধনা দিয়ে তাদের পরিবর্তিত করাতে হবে। অযথা ভগবানের কাছে নালিশ অভিযোগ করায় কোন ফল হয় না। এতে ভিতরের ক্ষোভ ও ব্যথা বাড়ে।

যাই কর না কেন কখনও ভুলবে না তোমার লক্ষ্য কি – যা তুমি তোমার জীবনে গ্রহণ করেছ।"

**(15.10.1936 - 24.10.2019)**

**স্মৃতিচারণ** **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

পার্থসারথি পত্রিকা তার ২৯ বছর পূর্ণ করছে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬ সংখ্যায়। আষাঢ়ে সে তিরিশ বছরে পড়বে। দিনগুলি দেখতে দেখতে কেটে যায়। এই পত্রিকা পরিচালনার জন্য যাঁরা আমাদের সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলের নাম লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁরা হচ্ছেন অগণিত সহৃদয় পাঠকবৃন্দ। শ্রীপ্রীতিকুমারের প্রয়াণের পর প্রায় সকলেই গ্রাহক থেকেছেন এবং নিজেরাই M.O. করে বা সরাসরি বার্ষিক চাঁদা দিয়েছেন। খুব সামান্য গ্রাহকই নাম প্রত্যাহার করেছেন। এটা আমাদের পক্ষে সন্তোষজনক বৈকি। অর্থনৈতিক দিক থেকে শ্রী নীরেন মৈত্রের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আন্তরিকভাবে সহায়তা করেছেন ডঃ শ্রীমতী কেয়া মুখার্জী, শ্রী সুখদাচরণ মজুমদার, শ্রীমতী গীতা কুণ্ডু, পার্থ কুণ্ডু ও শ্রীমতী চিত্রা পাল। এরা সময় মতো উৎসাহ দিয়ে আমাদের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে যা কাগজ ও মুদ্রণের খরচ বেড়েছে তাতে কেবলমাত্র কোন একজনের দ্বারা একটি পত্রিকা চালানো সম্ভব নয়। আবার আমাদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক তবু নিয়মিত কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেনই, সে দাবীও করতে পারিনা। তবে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর কারও সহায়তায় যদি অমনোযোগ দেখা যায় তাহলে দুঃখ হয় ঠিকই। তবু আমরা পথিক, পথ আমাদের চলতেই হবে। মাঝ পথে থেমে যাবার শিক্ষা আমরা পাইনি। দিনের পর দিন দেখেছি শ্রীপ্রীতিকুমার কি প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন এই পত্রিকাটি চালাবার জন্য। যে ব্যথা ক্ষোভ তাঁর ছিল, বেশীরভাগ লিখে রাখতেন দিনলিপিতে। আজ সব দেখে অবাক হয়ে যাই। এ দিকটি আমার জানা

DO NOT COPY

ছিল না। কতজনে কত প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিয়েছিলেন, আজ আর কারও দেখা নেই। ভালই তো! ঈশ্বর আমাদের গড়েপিটে তৈরি করে নিচ্ছেন। দেখিই না পারি কিনা। শ্রীপ্রীতিকুমার নেই আমরা বিশ্বাস করিনা। আমরা চলি ফিরি, খাই দাই তাঁকে নিয়েই। আমরা এখনও তাঁরই আশ্রয়ে বাস করছি – তাই আমরা একটা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছি। জানি উত্তীর্ণ হবই।

এর মধ্যে একজনের কথা যদি না বলি তাহলে ভীষণ ত্রুটি হয়ে যাবে, সে হোল রেখা সিকদার। মেয়েটি হঠাৎ তার ছেলেকে নিয়ে আমাদের বরানগরের বাড়িতে এলো। সে থাকে সুদূর জার্মানীতে। বছরে একবার তার আসা চাই-ই। প্রথম প্রথম সবার মত আসতো যেতো। হঠাৎ কবে থেকেই যেন সে খুব কাছের হয়ে গেলো। এখন সে আমারও অতি কাছের, অতি আপন। আমি তার নিষ্ঠা দেখেছি, ভালবাসা দেখেছি। তার কান্না দেখেছি, তার আকুলতা দেখেছি। আমি কখনও তাকে বলতে শুনিনি, "আমি এই করেছি, আমি ঐ করেছি।" এখনও সে আমার ব্যথা বেদনায় ছটফট করে ওঠে। অত দূর থেকে সে দু'চারটা টেলিফোন করে ফেলে কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য। শ্রীপ্রীতিকুমার প্রায়ই যা মনে হতো লিখে রাখতেন। তাঁর প্রয়াণের পরই আমি একটি ডায়রীতে দেখেছিলাম জীবনের শেষে তাঁর কোনও অনুভূতির কথা। সে লেখাটি আমার ঠিক এই মূহুর্তে কাউকে বলা বা দেখান সম্ভব নয়। কিন্তু সেটি পড়ে আমার প্রাণের মধ্যে কেমন হাহাকার করে উঠেছিল। আজ আমি আন্দাজ করতে পারি কেন তিনি হঠাৎ ওভাবে আবেগ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। আমার শুধু কষ্ট হয় কেন লোকটিকে কেউ বুঝতে চাইল না, কেন কেউ তাঁকে ভালবাসার চেষ্টা করলো না? কেন শুধু "দেবার জন্য দাতা" হয়ে রইলেন? আজও দেখি দেহ ছেড়ে গিয়েও তিনি নিস্তার পান নি। সেই চাওয়া পাওয়ার মধ্যেই রয়েছেন।

অনেকে মনে করেন তাঁরা শ্রীপ্রীতিকুমারের মনের মধ্যে প্রবেশ করে বসে আছেন। শ্রীপ্রীতিকুমার তাঁদের সব বলে গেছেন। তাঁরা সব assessment করে ফেলেছেন। আমার খুব হাসি পায়। আমিও আজকাল শ্রীপ্রীতিকুমারের মত ঘাপটি মেরে বসে থাকি। আমি তাঁর মত ক্ষমার আধার নই। আমার মান অভিমান, সম্মান অপমান, সব বোধগুলিই প্রবল। আমার ভোগান্তি আমাকে ভুগতে হবেই, তারজন্য আমি কাউকে দায়ী করি না – তবু ঈশ্বরের কাছে বলি, "হে ঈশ্বর,

যারা অভিনয় করে, মিথ্যাচারণ করে, নিজেদের সুবিধানুযায়ী কথার জাল বোনে – তুমি তাদের বুঝতে দিও তারা কি করছে। তাদের উপলব্ধি দিও।"

গত আড়াই বছরে আমি বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলা করলাম। এখনও শেষ হয়নি। এ সময় প্রায় সকলেই আমাকে ভালবাসা দিয়ে স্নেহ মায়া মমতা দিয়ে আগলে রেখেছেন। তবুও সবার যাওয়া আসা অনেক কমেছে। সবারই তো ক্লান্তি আসে। তবু দেখি যাকে খুব প্রয়োজন মনে হয়, তার কথা ভাবতে না ভাবতে তিনি হঠাৎ এসে পড়েন। নীরেনদা হোক, অনু হোক, কিশোর হোক, অপু, খোকন, গীতাদি বা মনু যেই হোক। শ্রী দীপক বসুও ছুটে আসেন কোন সমস্যা হলে। মঞ্জুলাদি আর আদিত্যদা তো আছেনই সবসময়। তাই আমার মত চির-নাস্তিক মহিলাটিও ধীরে ধীরে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখতে শিখছেন। আর, এই বিশ্বাসটুকুর জন্যই এখনও সংগ্রাম করে চলেছি। ঈশ্বরের কৃপা না হলে কবেই আমি ও বাপী ছারপোকার মত মৃত্যুবরণ করতাম। চেষ্টা তো কম হয় নি! আমার শেখ মুজিবরের মত বলতে ইচ্ছে করে, "আমারে দাবায়ে রাখতি পারবা না।"

সত্যি কবেই যেন এই কর্মযোগ শুরু হয়েছিল। আমার বাবা খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন – "তোমাকে কাজের লোকের মত active হতে হবে।" আমি সেই কাজের লোকের পরিশ্রমকেও প্লান করে দিয়েছি এত বছরে। মানুষ অভ্যাসের দাস। কেউ কাজ না করে মোটা হলে গীতাদি চেঁচিয়ে ওঠে, "ও বৌদি, এর কর্মযোগ একদম নেই গো!" আমি নিজের দিকে তাকাই, কর্মযোগ থাকা সত্ত্বেও এমন নীরেট চেহারা আমার কি করে হল? গত আড়াই বছরে আমার কোন পরিবর্তন নেই। দু-দুবার গাড়ীতে ধাক্কা খেলাম। ভয়ে চোখ বন্ধ করে আছি। অনেকক্ষণ হয়ে যাওয়াতে চোখ খুলে দেখি আমি দাঁড়িয়ে আছি। অন্য একটি লোক সাইকেল নিয়ে ছিটকে পড়েছে লরীর ধাক্কায়। ১৯৮০-৮১ সালে দাঁতের যন্ত্রণা। Dentist- এর কাছে গেলাম।তিনি injection দিতেই অবস্থা কাহিল। সিরিঞ্জটা ধোবার জন্য তিনি পিছন ফিরতেই সোজা বাড়ীতে শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে। এ ঘটনা বছর কয়েক আগেকার। একগাল হেসে বললেন, "পালিয়ে এসেছ? বেশ করেছ। লোকটা একদম জল্লাদের মত। কেবল হাঃ হাঃ করে হাসে।" আবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে দুজন লোক দিয়ে শ্যামবাজারে ডঃ বসাকের কাছে পাঠালেন, যাতে আর পালিয়ে আসতে না পারি।

পরীক্ষা দিতে গেলে তিন চারজন আত্মীয় বা বন্ধু হলের বাইরে বসে থাকতেন। একটু ভালো না লাগলেই পরীক্ষার হল থেকে পালিয়ে যাবার অভ্যাস ছিল আমার। পড়াশোনা বেশীটাই বিয়ের পর করেছি। শ্রীপ্রীতিকুমারের সাকরেদরা মোটামুটি তখন ৫০/৬০ বছর বয়সের ছিলেন। তাদের মত অভিজ্ঞ সাকরেদ দিয়ে আমাকে পরীক্ষার হলে পাঠাতেন।

সুনন্দনের জন্মের সময় আমি পরীক্ষা দিচ্ছিলাম। হাসপাতালের কার্ড আমার ব্যাগেই থাকতো। পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এসেই আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। সুনন্দন জন্মেছিল রাত ১২টার পর। পরদিন আমার ইতিহাস পরীক্ষা ছিল। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ কিছুতেই ছাড়বেনা, আমিও নাছোড়বান্দা। আমি বললাম, "আমাকে না ছাড়লে আমি চীৎকার করে কাঁদবো।" আমার বাল্য কালের বন্ধু অনিমা তখন R. G. Kar Medical College-এ ছিল। ওর মধ্যস্থতায় Risk Bond দিয়ে ছাড়া পেলাম। শ্রীপ্রীতিকুমার আমাকে নিয়ে Scottish Church College-এ পরীক্ষা দিতে নিয়ে গেলেন। সেবার Scottish Church College-এর Principal তাঁকে যা রাগারাগি করেছিলেন! আমার খুব মজা লেগেছিল। তাঁকে সবাই খুব মানে, আর তিনি বকুনি খাচ্ছেন! এ দৃশ্য কি ভোলবার?

পরবর্তী জীবনে মারাত্মক বকুনি খেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছে। তাতেই তাঁর জীবনের সব ওলট পালট হয়ে যায়। যে স্নেহ ভালবাসা পাবার ও দেবার গণ্ডীতে বাস করতেন, সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন। সবার সাথে মিশেছেন, হেসেছেন। আসা যাওয়া করেছেন, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেন নি।

একটি জীবনের কাহিনী দু'চার পাতায় লেখা সম্ভব নয়। এলোমেলোভাবে ঘটনাগুলি এসে পড়ে। মহাকালের চক্রে সবই অদল বদল হয়ে যায়। কিন্তু যার জীবনে দাগ কাটে সে কোনও ঘটনা ভুলতে পারে না। আজ তাঁকে বলা হয় উচ্চকোটির সাধক; তিনি কখনও জ্যোতিঃস্বরূপ, কখনও স্পষ্ট। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁকে আজ ওভাবে ব্যাখ্যা না করে, যদি একটু সাধারণ গৃহের গণ্ডীর মধ্যে ভালবাসা দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হতো। তিনিতো গৃহে স্ত্রী, ভাই-বোন, মা-সন্তান, পৌত্র-পৌত্রী সবাইকে সমানভাবে ভালবেসে গেছেন – যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেবার চেষ্টা করেছেন। আমরা তাঁকে কি দিতে পেরেছি? আমাদের মনের মত কাজ হলে তাঁকে ভগবানের আসনে বসিয়েছি, না হলে দিনের পর দিন তাঁর সাথে কথা বলিনি। স্বার্থে

লাগলে দুটি কটু কথা বলতেও দ্বিধা করিনি। সে প্রায়শ্চিত্ত করার সময় হয়েছে কি? অন্যের খবর আমি জানি না, আমার শুরু হয়েছে এটুকু বলতে পারি –

যে আমি ছিলাম অতি সরল, প্রাণবন্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি, সেই আমি শ্রীপ্রীতিকুমারের সাথে বিবাহের পর অসহনীয় হয়ে উঠলাম কারও কারও কাছে, কি করে কি জানি! আমাদের ছেলেটাকে তার বাবা একটু আদর করলেই সকলের মুখের উপর দিয়ে একটা ছায়া সরে যাবার কথাটাতো তাঁর দিনলিপিতেই পাওয়া যাবে। এসব ঘটনার সাক্ষী দু'একজনতো এখনও জীবিত আছেন। যে কোন কারণেই হোক সব কথা আমার দু'এক বছরের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তারপর সম্ভব হলে একটি একটি করে পাতা উদ্ধৃত করে দিতে পারবো।

দিন কারও জন্য থেমে থাকে না। দিন কেটেই যায়। সুখের পর দুঃখ ..... আবার সুখ, চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে ..... এ কথা তো সেই কবেই পড়েছি। আমারও এ'রকম দুঃসময় থাকবে না। আবার আমি সব বাধা কাটিয়ে উঠব। যারা আমাকে এই দুর্দিনে সহায়তা করলেন তাদের ভালোর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব; যারা চাতুরী করলেন তাদের পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করব।

আমিতো এখন রইলামই .....।

– – – – – – – – –

(** রচনাকাল - মে, ১৯৮৯)

**অন্নচিন্তা** **শ্রী অরবিন্দ**

অত্যধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিলে দেহের মধ্যে জড়তা আসে, দেহ ভারী হইয়া যায়। আবার নিতান্ত অল্প খাইলেও দেহ ক্ষীণ হয় এবং স্নায়বিক দুর্বলতা আসে। সুতরাং দেহের আবশ্যকতা অনুযায়ী কত পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতে হইবে তা নির্ধারিত করা প্রয়োজন।

খাদ্যের প্রতি আসক্তি রাখা, লোভী হওয়া, ভোজনে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করা, খাদ্যের বিষয়টিকে আমাদের জীবনে অযথা প্রাধান্য দেওয়া পূর্ণযোগের পরিপন্থী। কোন একটি খাদ্য যে রসনা তৃপ্তিকর সেই বোধ থাকায় কিছু অন্যায় নাই। কিন্তু সেই রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যের জন্য কোন বাসনা বা লালসা রাখা, তা পেয়ে উল্লসিত হওয়া, না পেলে অবসাদগ্রস্ত হওয়া বা আক্ষেপ করা উচিত নয়।

খাদ্য সম্বন্ধে শান্ত ও সমভাব অবলম্বন করতে হবে। মনের মতন সুস্বাদু এবং প্রচুর পরিমাণে খাদ্য না পেলে অস্থির হয়ে পড়া বা অসন্তুষ্ট হওয়া অনুচিত। শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিত পরিমাণে আহার করা চাই, খুব বেশীও খাবেনা, খুব কমও না। খাদ্যের প্রতি আসক্তিও থাকবে না, বিতৃষ্ণাও থাকবে না।

সকল সময়েই খাদ্যের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থেকে, মনকে ওই নিয়ে বিব্রত রেখে খাদ্যের বাসনা থেকে মুক্তিলাভ করা যায় না। খাদ্যের বিষয়টিকে আমাদের জীবনে যথাস্থানে রাখতে হবে। সেই স্থানটি হোল একটি ছোট্ট কোণ। খাদ্যের উপর একাগ্রচিত্ত না হয়ে অন্যসব প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে মন প্রাণকে ব্যস্ত রাখাই সমুচিত পন্থা।

* * * (শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে) * * *

**স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশানুরাগ** **ইন্দিরা গঙ্গোপাধ্যায়**

মানব সমাজ যখন অজ্ঞানতার কুটিল অন্ধকারে ধীরে ধীরে অচেতন হয়ে পড়ছিল তখন ভারতবর্ষের একটিমাত্র মানুষ সেই অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে নতুন জ্ঞানের, নতুন প্রাণের, নতুন চেতনার আলোকবর্ত্তিকা হাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্গম পথে এগিয়ে এসেছিলেন- তিনি বীর সন্ন্যাসী মহানায়ক, স্বদেশ সত্তার প্রতিভূ- 'স্বামী বিবেকানন্দ'। তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ভারতের নব জাতীয়তার উদ্বোধনের দূত। যেদিন তিনি নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের আধ্যাত্মিকতার অমর-বাণী জগৎকে শোনাতে হবে, সেদিন থেকেই সত্য-সাধনার দুরূহ, বন্ধুর পথে তিনি হলেন একাকী যাত্রী; দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য হল তাঁর চলার গতি।

সেই একক পুরুষ, তাঁর অন্তরের আলোর বাণী, জাগরণের বাণী বহন করে অন্ধকার অপসারিত করে রাঙ্গা প্রভাতকে দেশের হতলাঞ্ছিত মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। মানবতার প্রথম রশ্মিটি তাঁরই হৃদয়ে যেন অনিবার্যভাবে প্রবেশ করেছিল, তাই আত্মসুখ, আত্মসর্বস্বতার বন্ধন ছিন্ন করে তিনি বলে গিয়েছিলেন, "দেশের লোকের হৃদয়নিহিত আত্মাকে প্রবুদ্ধ করার জন্য শত শত

বার যদি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তাতেও আমি পশ্চাৎপদ নই।" মহান আদর্শের আলোক-শিখা সম্মুখীন করে তিনি চলেছিলেন উদয়-দিগন্তে। সে দিগন্ত তাঁর যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী, সর্বত্যাগী শঙ্করের দেশ ভারতবর্ষ।

সংস্কার গ্রস্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন দেশের বুকে নতুন প্রাণ এনে দেবার জন্য তিনি বেদান্তের ব্যাখ্যা দিয়েছেন- শক্তি, 'শক্তি নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'-বলহীন কখনও আত্মাকে লাভ করতে পারে না। তাই আধখানা রুটি পেলে যাদের তেজ ত্রৈলোক্যে ধরবে না সেই কৃষক, শ্রমজীবীদের হাতে নতুন ভারত গঠনের ভার তুলে দিতে চেয়েছেন। তাঁর সেই সুপ্রসিদ্ধ বাণী শতসহস্রবার স্মরণ করতে ইচ্ছে হয়, ..."নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে।" বিবেকানন্দের জীবনের ব্রত ছিল এদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা, প্রকৃতপক্ষে দেশের অগ্রগতির ভারী চাকা যারা সর্বশক্তি দিয়ে দুর্বল গতিতে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই দুর্বল অসহায়দের একমুঠো ছাতু দিয়ে, আধখানা রুটি দিয়ে সেই শিথিল অগ্রগতিকে স্রোতময় বেগসম্পন্ন করে তুলতে তিনি চেয়েছিলেন। ভগিনী ক্রিস্টিনের চিঠি থেকে স্বামীজীর সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি, "His compassion for the poor and downtrodden, the defeated was a passion...he would willingly have offered his flesh for food and his blood for drink to the hungry." যারা তাঁর স্বপ্নের ভারতকে বাস্তব রূপায়নে সহায়তা করবে তাদের তিনি মনের মতো করে গড়তে চেয়েছেন। তাই তিনি বলে গেছেন "Man making is my mission."

দেশের উন্নতিকল্পে শুধু দেশবাসীকেই নয় বিদেশের মানুষের সহায়তাও তিনি চেয়েছেন। ম্যাকলাউডের মতো বহু বিদেশীকে অনুরোধ করেছিলেন, 'ভারতকে ভালোবাসো।' তিনি নিবেদিতাকে প্রধানতঃ ভারতীয় আদর্শে বিশেষতঃ হিন্দুভাবে গড়ে তুলেছিলেন; হিন্দু নারী-সমাজেরই সেবার জন্য। হিন্দু নারীসমাজকে পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত করে তিনি উন্নতির নির্দেশ দেন নি; উপরন্তু নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'তোমার সাধনা হবে,-তোমার চিন্তারাশিকে তোমার প্রয়োজনবোধকে, তোমার ধারণাগুলিকে হিন্দুভাবে রূপায়িত করা।' ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'The Master as I saw him' গ্রন্থে লিখেছেন, 'The queen of his adoration was his motherland'- আরাধনার দেবীই ছিলেন তাঁর মাতৃভূমি। বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমের গভীরতা মার্গারেট এলিজাবেথ

নোবলকে রূপান্তরিত করেছিল ভগিনী নিবেদিতায়। তিনি চাইতেন পাশ্চাত্যবাসীরাও শ্রদ্ধা ও প্রেমের দৃষ্টিতে তাঁর দেশমাতাকে দেখুক, তাঁর সেবায় অগ্রসর হোক।

বিবেকানন্দ ভারতের ধর্মরত্নকে উদ্ধার করে কৃষ্টির বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছেন। মহত্তর ভারত রূপায়নে তাঁর প্রধান সোপান ছিল ভারতের শাস্ত্রধর্ম। তাই তিনি বলেছিলেন, 'ভারত আবার উঠিবে জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে, গৈরিক বেশের সহায়ে।' ভারতবর্ষকে নবযৌবনশালিনী ও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিত করে তোলাই ছিল বিবেকানন্দের একমাত্র স্বপ্ন। স্বদেশকে তিনি মহামানবতার পীঠস্থানে পরিণত করে দিয়ে গেছেন। চির-অবহেলিত ভারতের দিকে বিশ্বের শ্রদ্ধাবন্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন, অন্যদিকে ভারতের সমাজ-জীবনে যে যুগ যুগান্তরের কুসংস্কার স্তুপীকৃত হয়ে উঠেছিল তা দূরীভূত করে পুনর্জন্মের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। ভারতের মানুষকে , তার ধর্মকে, তার পরিধানকে, তার ভাষাকে, তার কুমারীত্বকে, বৈধব্যকে, স্বামীজী ভালবেসেছেন। ভারতের দর্শন, সাহিত্য, উল্লাস, হতাশাকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

স্বামীজীর দেশকে ভালোবাসা? কে তার পরিমাপ করবে? সে ভালোবাসা কত গভীর তা ঘটনার উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। বিবেকানন্দ দেশকে যন্ত্রণার মধ্যে সেবার উষ্ণস্পর্শ দিয়েছেন, হতাশার মধ্যে আশা জাগিয়েছেন, সংশয়ের মধ্যে দিয়েছেন সাহস। ভারতের আত্মমহিমার দিকে তিনিই প্রথম জাতির নয়ন উন্মীলিত করে দিয়ে গেছেন। প্রোজ্জ্বলমনা এই সন্ন্যাসী ভারতের গোপন আশা-আকাঙ্খাকে ভাষা দিয়েছেন, ভারতের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বকে বিশ্বের নিকট পরিচিত করে দিয়ে গেছেন, 'তিনি দুঃখিনী ভারত মাতার বীরসন্তান, চিরলাঞ্ছিত আর্যজাতির কুলতিলক।' ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনও স্বামীজীকে পেয়েছিল নেতারূপে পথপ্রদর্শকরূপে।

স্বদেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন স্বামীজীর স্বদেশপ্রীতির বাণী কিরূপ অমূল্য নিদর্শন। স্বামীজীর 'দরিদ্রনারায়ণ' কথাটি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় লোকমান্য তিলক, গান্ধিজী এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গঠনমূলক কাজের অন্যতম হাতিয়ার ছিল বলা চলে। বিবেকানন্দের বাণীর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রধান সোপান ধর্মসমন্বয়কে সর্বান্তঃকরণে ভারতবাসী গ্রহণ করতে চেয়েছিল। স্বামীজীর বাণী ছিল, "আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ দুই মহান মতের বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীর দেহে সমন্বয়ই একমাত্র আশা।" তাঁর মানসিকতা স্বদেশচিন্তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত ছিল। Freedom, Freedom is

the song of the soul. দেশের প্রধান প্রধান সঙ্গীত স্বাধীনতা হওয়া উচিত- এই বাণী যখন স্বামীজীর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নির্গত হল তখন তা দেশবাসীকে উন্মত্ত করে তোলে। তিনি এক জায়গায় বলেছিলেন, "হে হিন্দুগণ, তোমাদিগকে কেবল ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের এই মহান জাতীয় অর্ণবপোত শত শতাব্দী যাবৎ হিন্দুজাতিকে পারাপার করিতেছে। সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটি ছিদ্র হইয়াছে...আমাদের ভারতমাতার সকল সন্তানেরই এই ছিদ্রগুলি বন্ধ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।" দেশের প্রতি তাঁর আস্থা ও আশা ছিল গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ।

স্বামী বিবেকানন্দ যে সময় জন্মগ্রহণ করেন তখন ইংরেজরা আমাদের দেশে সব দিক দিয়ে প্রভাব বিস্তার করছে। এই অবস্থায় ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের ভাবধারার সমন্বয় সাধন না করতে পারলে ঐতিহ্যশালী ভারত পরানুকরণমত্ততার কালগ্রাসে নিক্ষিপ্ত হবে এই আশঙ্কায় তিনিই প্রথম দেশের মানুষকে মোহনিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলার গুরুদায়িত্ব বহন করেছিলেন। তিনি এই সংকটতম সময়ে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে গেছেন, "পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার জল পান কর, তারপর সম্মুখ প্রসারিত দৃষ্টি নিয়া অগ্রসর হও এবং প্রাচীনকালে ভারত যতদূর উচ্চ গৌরবশিখরে আরূঢ় ছিল তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর উজ্জ্বলতর, মহত্তর অধিকতর মহিমামণ্ডিত করিবার চেষ্টা কর।"

নিবেদিতা লিখেছেন, 'সময় সময় এরূপ মনে হইত, যেন স্বদেশের অতীত গৌরবই স্বামীজীর ষোল আনা মনঃপ্রাণ অধিকার করেছিল।' 'চরিত্র গঠন কর, মানুষ হও, সমাজসেবা ব্রতে এগিয়ে পড়, দেশকে মা জ্ঞানে পুজো কর, সমাজের দুর্বলতা দূর কর, অভীঃমন্ত্রে দীক্ষিত হও, সমাজে যারা অনুন্নত, দরিদ্র, হীন, মূর্খ, নিপীড়িত, তাদের সেবায় লেগে যাও, নারী জাতিকে সম্মানিত করে তোলো'- এ সবই বিবেকানন্দের বাণী, যেগুলি চিরকালের মানুষের আত্মিক আহারের সমতুল, দেশের কল্যাণ-সাধনের কোন দিকই তাঁর সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারেনি, বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রীতিমূলক বাণীগুলি যেন একটা দিব্য মুহূর্তের সৃষ্টি। আবিষ্ট মনের আত্মপ্রকাশ, সর্বতন্ময়ীভূত সম্বিতের বিদ্যুৎপ্রবাহ যা দেশের প্রতিটি ধূলিকণাকেও স্পর্শ করে পরম আশ্বাসে ভরে তুলতে পারে। দেশকে সংগঠিত করবার মহান ব্রতে ১৮৯৭-তে প্রতিষ্ঠা করলেন 'রামকৃষ্ণ মিশন'। ১৮৯৯-এ প্রতিষ্ঠিত হল নবযুগের পুণ্যতীর্থ বেলুড় মঠ। উভয় প্রতিষ্ঠানই দেশকল্যাণকামী বিবেকানন্দের স্বদেশচেতনার উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

আদর্শহীন জাতিকে মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করলেন তিনি, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' ভারতবাসীকে তিনি জাগিয়ে তুললেন অধ্যাত্মচেতনার গভীর মন্ত্র উচ্চারণে। নতুন করে ভারতবর্ষ আবিষ্কৃত হল। স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ বলেছেন,

"If we boast ourselves to be the descendants of saints and sages we must come forward and respond to the clarion call of this greatest patriot saint of India.

যে দেশ অর্ধনগ্ন তাপসগণের বংশধর বলে পরিচয় দিতে গৌরব করে সে দেশ ভারতবর্ষ। বিবেকানন্দই প্রথম স্বদেশকে এই দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। স্বদেশপ্রেমের অর্জনে দেশবাসীকে তিনি দিব্যদৃষ্টি দিতে চেয়েছেন, বলেছেন, "মানুষ কত অধিক বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে পাশ্চাত্য দেশ সেই সমস্যার পূরণ করিয়াছে; কিন্তু ভারত এদিকে, মানুষ কত অল্প লইয়া থাকিতে থাকিতে পারে, এই সমস্যার পূরণ করিয়াছে।" ভারতের মৃত্তিকা তাঁর স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ তাঁর কল্যাণ, দেশের সহিত নিজেকে একাত্মীভূত করার নিদর্শন এ অপেক্ষা অধিক আর কি হতে পারে?

'আধ্যাত্মিকতাই ভারত'-এই হল বিবেক-বাণী। দুর্বল, আত্মবিস্মৃত জাতির অনড়দেহে নবযুগের জীবন কাঠির স্পর্শে তিনি সঞ্চারিত করলেন মৃত্যু-তারণ, শঙ্কা-হরণ অভূতপূর্ব প্রাণ-স্পন্দন।

তিনি গৃহ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন বটে; কিন্তু ভারতবর্ষই ছিল তাঁর প্রধান সংসার, ভারতই তাঁর প্রাণ, ভারতই তাঁর ধ্যান, জ্ঞান ,ভারতের কথাই তিনি ভাবতেন, ভারতের জন্যই তিনি জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁর চোখের প্রতি স্পন্দনে ধমনীর প্রতি শোণিত বিন্দুতে ভারতের চিন্তা স্থায়ী আসন পেয়েছিল।

সিস্টার নিবেদিতার উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, "Swamiji was a true lover, but the queen of his love was India, at every breath he would think of the welfare of India." আকুমারিকা হিমাচলকে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন সেই উদাত্ত আহ্বান-"উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" আজও ভারত তথা ভারতবাসী বিবেকানন্দের চির-ভাস্বর জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়।

**ভক্ত-বৎসল শ্রীচৈতন্য** **ডাঃ রুহিদাস সাহা**

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছেন-"হেন সে চৈতন্যদেব শ্রীভক্ত বৎসল"। যথার্থই লিখেছেন বৃন্দাবন দাস। ভক্তদের জন্যে তাঁর গভীর ভালবাসা, তাঁদের জন্যে তাঁর অসীম মমত্ববোধ শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রতি অধ্যায়ে সুন্দর ভাবে প্রকাশ লাভ করেছে।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভাব বিভোর শ্রীচৈতন্যকে ভুলিয়ে বৃন্দাবনের পরিবর্তে শান্তিপুরে নিয়ে এসেছেন নিত্যানন্দ। এই অবস্থায় শ্রীচৈতন্য ভক্তদের বলেছেন- 'তোমাদের অনুমতি নিয়ে যাইনি বলেই আমার বৃন্দাবন যাওয়া হল না।' এবার তিনি চলেছেন নীলাচলের উদ্দেশ্যে। একে একে সব ভক্তের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছেন সকলকে। "সভার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গন"। ভক্তদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন-"আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি সত্য, তবে তোমাদের প্রতি আমি উদাসীন হতে পারবো না, যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন তোমাদের ছাড়বো না।" তারপর বিদায় মুহূর্তে ভক্ত-বৎসল শ্রীচৈতন্য ভক্তদের কাছে অনুমতি চেয়েছেন- 'আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন'।তারপর সকলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চললেন তিনি নীলাচলের উদ্দেশ্যে। ভক্তগণ বিচ্ছেদ ব্যথায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

শ্রীচৈতন্য নীলাচলে অবস্থান করেছিলেন জীবনের শেষ অষ্টাদশ বছর। এই সময়ে তিনি ভক্তদের বলতেন-"প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা দরশনে"। ভক্তদের এভাবে আহ্বান জানাবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ "শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত"-এ লিখেছেন "এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে"। ভক্তগণের সঙ্গে মিলনে তাঁর যে কি আনন্দ! তাঁদের আগমনের অপেক্ষায় যেন ব্যাকুল হয়ে থাকতেন তিনি সারাটা বছর।

শ্রীচৈতন্য দর্শনের জন্যে ভক্তগণও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। রথযাত্রার সময় তাঁরা মিলিত হতেন পুরীতে। প্রতি বছর রথযাত্রায় বঙ্গদেশ থেকে আগত ভক্ত সমাবেশ হতো সেখানে। আসতেন শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস শিবানন্দ সেন প্রমুখ ভক্ত সুধীজনেরা। শিবানন্দ সেনের তত্বাবধানে আসতেন ভক্তগণ। সমাগত ভক্তগণ কতক্ষণে শ্রীচৈতন্যের দর্শন পাবেন তার জন্য যেমন ব্যাকুল হতেন, ঠিক তেমনই ব্যাকুল হতেন শ্রীচৈতন্য তাঁর ভক্তদের জন্যে। একবার বঙ্গদেশ থেকে সদ্য আগত ভক্তগণ দল বেঁধে শ্রীচৈতন্যদেবের সন্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছেন। একে একে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করছেন শ্রীচৈতন্য,

আনন্দে মন ভরে উঠছে সকলের, আনন্দিত শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ও। মুহূর্তে তাঁর মনের ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন উপস্থিত সকলে। ভক্তদের মধ্যে মুরারিকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল কন্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন–"মুরারি কোথায়? সে আসেনি কেন?" ভক্তগণ বল্লেন–"মুরারি ক্লান্ত তাই নরেন্দ্র সরোবরের কাছে বিশ্রাম করছেন তিনি।" এই কথা শুনে একটু যেন আশ্বস্ত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠালেন সেখানে। যতক্ষণ মুরারি এসে না পৌঁছোলেন ততক্ষণ কি এক অন্তর যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। সময় যেন তাঁর কাটে না। অবশেষে মুরারির আগমনে সুস্থির হলেন, আনন্দে তাঁর চোখে জল এলো। অতঃপর মুরারির ভক্তি ও বিনয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রুতে তাঁর পিঠ ভিজিয়ে দিলেন শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্যের ভক্ত–বাৎসল্যের এই সুন্দর চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে কবি কর্ণপুর রচিত 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যে'।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন–"সর্বকাল প্রভু বাঢ়ায়েণ ভক্ত স্য়।" যথার্থই বলেছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। এই হলো শ্রী চৈতন্যের অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। গোপাল চাপাল নামে এক ব্রাহ্মণ শ্রীবাস পন্ডিতের গৃহে উৎপাত করে তাঁকে উত্যক্ত করেছিল। কিছুদিন পর দেখা গেল গোপাল চাপাল কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছে। গোপাল চাপাল ভাবলো, শ্রীবাসের গৃহে উৎপাতের পরিণতিতেই তার এই দুরারোগ্য ব্যাধি। অপরাধ বিমোচনের মধ্য দিয়ে রোগ মুক্তির আশায় তাই সে গেল শ্রীচৈতন্যের কাছে। তাঁর এই অবস্থায় শ্রীচৈতন্যের কোমল হৃদয় বেদনার্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন "যদি পুন ঐছে নাহি কর আচরণ" তবে নিশ্চয়ই তোমার অপরাধ বিদূরিত হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন– "অন্যায় করেছ তুমি শ্রীবাস পন্ডিতের কাছে, তাই তোমাকে যেতে হবে তাঁর দ্বারে।"

চাপাল গোপাল শ্রীবাস পন্ডিতের কাছে গিয়েছিল, শ্রীবাস তাঁকে ক্ষমাও করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে শ্রীচৈতন্য একদিকে যেমন ভক্তের মহিমা প্রচার করলেন, অন্যদিকে তেমনি ভক্তকে স্বীয় মর্য্যাদায় ভূষিত করলেন। এমন ভাবেই একদিন নিত্যানন্দের মহিমা দেখিয়েছিলেন তিনি, তাঁর মহত্বের বিজয় সেদিন ঘোষিত হয়েছিল। মাধাইয়ের কলসির কানায় নিত্যানন্দের কপাল ক্ষত বিক্ষত, সেই ক্ষতস্থান থেকে রক্তস্রোত বইছে। এর জন্যে একটুও বেদনা অনুভব করলেন না নিত্যানন্দ, এত রক্তস্রোতেও তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই, বরং তিনি বল্লেন–"মারিলি কলসীর কাণা সহিবারে পারি, তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি।" এরূপ অবস্থায় অমিয় শ্রীচৈতন্যও এই একই কথাই বলতেন। হয়তো জগাই মাধাইয়ের

জন্যে আরও বেদনার্ত হতেন। কিন্তু নিত্যানন্দের এই অবস্থা দেখে তিনি বিচলিত হলেন, ব্যথিত হলেন। ভক্ত নিত্যানন্দের উপর আঘাতে তাঁর ক্ষুব্ধ মন উত্তেজিত হয়ে উঠলো। নিত্যানন্দের মহত্ব দেখে ইতিমধ্যে জগাই মাধাইয়ের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, ক্রমে ক্রমে তা পূর্ণতায় পৌঁছে গিয়েছে। এই অবস্থায় মাধাই শ্রীচৈতন্যের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। এ আঘাত নিজের উপর হলে শ্রীচৈতন্য আগেই ক্ষমা করতেন, হয়তো ক্ষমা প্রার্থনারও প্রয়োজন হতো না। কিন্তু ভক্তের উপর আঘাতে ব্যতিক্রম ঘটে গেল। আরও আক্রমণ থেকে তাঁর ভক্ত নিত্যানন্দকে রক্ষা করেছিল বলে শ্রীচৈতন্য জগাইকে কোলে টেনে নিলেন, কিন্তু মাধাইকে ক্ষমা করলেন না, বল্লেন–"আঘাত করেছ তুমি নিত্যানন্দকে, তাঁর কাছেই তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর।" তিনি জানতেন নিত্যানন্দের কাছে সে অবশ্যই ক্ষমা পাবে। তাই হল, নিত্যানন্দ মাধাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা করলেন। এই ভাবেই শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের মহিমা প্রকাশ করলেন, ভক্তকে জয়ী করলেন।

দক্ষিণ ভারত পরিক্রমায় একাকী যাবেন শ্রীচৈতন্য। ভক্তদের বললেন সে কথা। অনুমতিও চাইলেন তাঁদের কাছে। শ্রীচৈতন্যের এই সিদ্ধান্তে ভক্তগণ ব্যথিত, তাঁরা ভয়ানক চিন্তিত। তাঁরা বললেন– "তা হয় না ঠাকুর। বিদেশ বিভুঁয়ে জঙ্গলাকীর্ণ পথে তোমাকে একাকী আমরা যেতে দিতে পারি না। আমাদের কয়েকজনকে তোমার সঙ্গে নিতেই হবে"। ভক্ত-বৎসল শ্রীচৈতন্য শেষ পর্য্যন্ত ভক্তদের আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারলেন না– কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নিতে রাজী হলেন। বিশেষ উদ্দেশ্যেই তিনি ভক্তদের সঙ্গে নিতে রাজী হননি। সন্ন্যাসীরূপে সামান্যতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনি গ্রহণ করতেন না। ভক্তদের কাছে এই অবস্থাটা ছিল অসহ্য। তাঁদের বেদনার কথা জানাতেন শ্রীচৈতন্যকে। পুষ্পসম কোমল শ্রীচৈতন্য ভক্তদের সেই বেদনায় নিজেও বেদনা অনুভব করতেন। নিজের কঠোর বৈরাগ্যের কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারতেন, কিন্তু সেই বৈরাগ্য-কষ্টের কথা মনে করে ভক্তদের মনে যে বেদনার উদ্রেক হতো তা ছিল তাঁর কাছে অসহ্য। ফলে সামান্য হলেও তাঁর ইচ্ছার ব্যতিক্রম ঘটত। এই অবস্থা এড়াবার জন্যেই তিনি ভক্তদের সঙ্গে নিতে রাজী হতেন না। এ এক অদ্ভুত ভক্ত – বাৎসল্য শ্রীচৈতন্যের। অনন্য ভক্ত-বৎসল তিনি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যথার্থই বলেছেন–"শ্রীচৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্য অকথ্য কথন।"

হোসেন শাহের কারাগার থেকে পালিয়ে অনেক কষ্টে সনাতন গোস্বামী বারাণসী এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের অন্তর সনাতনের আগমন উপলব্ধি করলেন। চন্দ্রশেখরকে বললেন– 'দ্বারে এক ভক্ত এসেছে তাঁকে নিয়ে এসো'।

চন্দ্রশেখর বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, কোন ভক্ত নেই সেখানে, আছে শুধু একজন দরবেশ অর্থাৎ মুসলমান ফকির। তাই জানালেন শ্রীচৈতন্যকে। শ্রীচৈতন্য বললেন– 'তাকেই নিয়ে এসো।' দরবেশকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন চন্দ্রশেখর। ভক্ত-বৎসল শ্রীচৈতন্য কি করলেন তখন? কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন–"তাঁহার অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা। তাঁরে আলিঙ্গণ করি প্রেমাবিদ হৈলা।।" তারপর আরও যা করলেন শ্রীচৈতন্য তা কৃষ্ণদাস লিখেছেন এই ভাবে– "তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি লঞা গেলা। পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলা।।" তারপর কি করলেন? "শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সমার্জ্জন।" কেনই বা করবেন না, ভক্ত যে তাঁর প্রাণ প্রিয়! সনাতন বললেন–"তুমি আমায় স্পর্শ করছ কেন?" এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচৈতন্য যা বললেন তাঁতে তাঁর ভক্ত বৎসল রূপটি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। "প্রভু কহে– তোমা স্পর্শি পবিত্র হৈতে। ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে।।" সনাতন সম্পর্কে এক স্থানে শ্রীচৈতন্য বলেছেন–"পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম।"

মথুরা থেকে সনাতন এসে হরিদাসের কুটীরে উঠেছেন। সেখানে "সনাতনে দেখি প্রভুর হৈল চমৎকার।।" ভক্ত দর্শনে সে কি আনন্দ ভক্তবৎসল শ্রীচৈতন্যের। "সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা।" কিন্তু পিছিয়ে গেলেন সনাতন, বললেন– "আমায় ছুঁইয়ো না প্রভু, আমি অস্পৃশ্য। তার উপর সারা দেহে আমার চর্মরোগ, তা থেকে ক্লেদ নির্গত হচ্ছে প্রতিনিয়ত"। কিন্তু কে কার কথা শুনে। ভক্তকে আলিঙ্গন করতে ব্যাকুল যে শ্রীচৈতন্য। তাই বলাৎকারে প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল। কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল।।" সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই শ্রীচৈতন্যদেবের। পরে দেখা গেল তাঁর দেহে কত ক্লেদ লেগে গিয়েছে। তবুও সনাতনকে ধরে পাশে বসালেন। তারপর "কুশল বার্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।" শুধু সনাতনের নয়, একে একে মথুরার সকলের কুশল জেনে নিলেন শ্রীচৈতন্য। চর্মরোগাক্রান্ত সনাতনকে পরে পরে আরও অনেকবার শ্রীচৈতন্য আলিঙ্গন করেছেন। আলিঙ্গন করেই ক্ষান্ত হন নি তিনি, বলেছেন– "তোমার দেহ আমাকে লাগে অমৃত সমান।" এই প্রসঙ্গে একটি উপমাও তিনি দিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন–"মাতার হৈছে বালকের অমেধ লাগে গায়। ঘৃণা নাহি উপজয় আরও সুখ পায়।।" অর্থাৎ মায়ের গায়ে সন্তানের মল লাগলে মায়ের ঘৃণা জন্মে না, বরং তাতে তিনি আনন্দই পান।

রথের নীচে সনাতনের জীবন বিসর্জন দেবার সংকল্পের কথা শ্রীচৈতন্য জানতে পেরেই বেদনার্ত হৃদয়ে ছুটে এসেছেন সনাতনের কাছে। তিনি তাঁকে

বললেন- আমাতে তুমি আত্মসমর্পণ করেছ। অতএব তোমার দেহ আমার। যে দেহ তোমার নয় তাকে তুমি বিনাশ করতে চাও কেন? তোমার দেহের আমার বিশেষ প্রয়োজন। তোমাকে দিয়েই আমি মথুরা বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করব, শাস্ত্র রচনা করাব। তিনি বললেন-"এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব। তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমতে সহিব।" ভক্ত-বৎসল শ্রীচৈতন্যের কাছে ভক্তের এরূপ অভিপ্রায় তো অসহ্য হবেই। এভাবে তিনি সনাতনকে নিবৃত্ত করলেন। আবার যাবার সময় হরিদাসকে বলে গেলেন-"নিষেধিহ ইহারে যেন না করে অন্যায়।"

রাজপরিবারে চরম ভোগৈশ্বর্যে প্রতিপালিত রঘুনাথ দাস পিতা-মাতা-পরমা সুন্দরী ভার্য্যা ও জন্মভূমি সপ্তগ্রাম ত্যাগ করে তাঁর প্রাণের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের দর্শন আকাঙ্খায় পায়ে হেঁটে বহু কষ্টে নীলাচলে পৌঁছুলে তাঁর শ্রান্ত ক্লান্ত মুখখানি দেখে শ্রীচৈতন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। অসীম ব্যাকুলতায় নিজের পরিচারক গোবিন্দদাসকে ডেকে বলেছেন- গোবিন্দ, রঘুনাথ পথে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছে, অনেকদিন ওর উপবাসে কেটেছে। তুমি ওকে যত্ন করো, দেখে রেখো। কি অফুরন্ত ব্যাকুলতা! এই ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্রীচৈতন্যের যে ভক্ত-বাৎসল্য প্রকাশ পেয়েছে তার বুঝি কোন তুলনা মেলে না।

বৃন্দাবন থেকে শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে প্রত্যাগমনের পর বঙ্গদেশ থেকে ভক্তগণ নীলাচলে এসে ফিরে গিয়েছেন। রূপ গোস্বামী রয়ে গিয়েছেন পুরীতে। সেখানে বসে বিদগ্ধ মাধবম্ নাটক লিখছেন। তার দুই একটি শ্লোক শ্রীচৈতন্য পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। শ্রীচৈতন্য একদিন সার্বভৌম রামানন্দ স্বরূপ গোস্বামীকে নিয়ে রূপের গৃহে চলেছেন। যেতে যেতে পথে রূপ গোস্বামীর এমন ভাষায় প্রশংসা করতে লাগলেন যে, কৃষ্ণদাস গোস্বামী সে সম্পর্কে লিখেছেন- "নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ।"

রাজা প্রতাপ রুদ্রের সভা-পণ্ডিত সার্বভৌমের গৃহে নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজনে বসেছিলেন শ্রীচৈতন্য। সেই সময় সার্বভৌমের বুদ্ধিহীন জামাতা অমোঘ নিন্দাসূচক উক্তি করলে সার্বভৌম অন্তর্বেদনায় এতই পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি অন্নজলই ত্যাগ করেছিলেন। ভক্তের এই অবস্থার কথা জেনে শ্রীচৈতন্য আর স্থির থাকতে পারেন নি। তিনি ছুটে এসেছিলেন ভট্টাচার্যের গৃহে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলেছিলেন-"শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ।" তিনি আরও বললেন- 'তাবৎ রহিব আমি এথাই বসিয়া। যাবৎ না খাইবে তুমি প্রসাদ আনিয়া। সার্বভৌমকে খাইয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বছর বঙ্গদেশ থেকে ভক্তগণ এলে শ্রীচৈতন্যের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকত না। ভক্তদের তিনি পাশে বসাতেন, নিজের হাতে মালা চন্দন পড়াতেন। "আপন নিকটে প্রভু সভারে বসাইল। আপনে শ্রীহস্তে সবায় মালাচন্দন দিল।" ভক্তগণ এলে পুরীতে যেমন আনন্দের বান ডাকত, ঠিক তেমনই করুণরসের অবতারণা হতো বিদায়ের বেলায়। সেই সময় শ্রীচৈতন্য একে একে সকল ভক্তের কাছে যেতেন, তাঁদের গুণকীর্ত্তন করতেন, তাঁদেরকে আলিঙ্গণে আবদ্ধ করতেন। "শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন।" এবার শ্রীচৈতন্য এলেন রাঘব পণ্ডিতের কাছে। "রাঘব পণ্ডিতে কহে বচন সরস। তোমার শুদ্ধ প্রেমে আমি হই তোমার বশ।।" শিবানন্দ সেনের গুণকীর্ত্তন করে তাঁর হাতে বাসুদেব দত্তের ভার অর্পণ করলেন। বললেন – পরম উদার ইঁহো (বাসুদেব দত্ত) যে দিনে যে আইসে। সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে।" এই স্বভাবের জন্যে বাসুদেব দত্তকে কষ্টে পড়তে হতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি শিবানন্দ সেনের উপর এঁর দেখাশুনার ভার অর্পণ করলেন। এরপর "মুরারি গুপ্তেরে গৌর করি আলিঙ্গণ। তার ভক্তি–নিষ্ঠা কহে শুনে ভক্তগণ।" এই ভাবে একে একে সব ভক্তের মহিমা কীর্ত্তন করলেন তিনি। "ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ।" পঞ্চমুখে তিনি ভক্তের মহিমা কীর্ত্তন করলেন। তারপর বিদায় দিলেন সবাইকে। "এই মত সব ভক্তের কহি সে সে গুণ। সবারে বিদায় দিল করি আলিঙ্গণ।" ভক্তের বিদায়ে ভক্তবৎসল শ্রীচৈতন্যের সে যে কি অবস্থা হল সেকথাও বলেছেন "শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ– "ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষন্ন হৈল মন।"

ঠাকুর হরিদাস শ্রীচৈতন্যের একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি শ্রীচৈতন্যের কাছে আসতে সাহস পাচ্ছিলেন না, তিনি ইতস্ততঃ করছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত এসেছিলেন কিন্তু বড় হীনমন্যতা নিয়ে। হরিদাসকে দূরে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য, কিন্তু পিছিয়ে গিয়েছিলেন হরিদাস, বলেছিলেন 'আমি অস্পৃশ্য, আমাকে ছুঁইয়ো না, প্রভু।' শ্রীচৈতন্য তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন "তোমা স্পর্শি পবিত্র হৈতে।" এই উক্তির মধ্য দিয়ে তিনি ভক্ত হরিদাসের মহিমা কীর্ত্তন করলেন। ভক্ত হরিদাসকে তিনি আরও মহিমান্বিত করেছিলেন হরিদাসের দেহাবসানের সময়ে। হরিদাসের দেহত্যাগের সময়ে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন তাঁর শয্যাপাশে। তারপর তিনি "হরিদাসের তনু কোলে লইল উঠাইয়া। অঙ্গনে

নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া।" সংকীর্ত্তনসহ হরিদাসের প্রাণহীন দেহ সমুদ্রতীরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই সংকীর্ত্তনের 'অগ্রে মহাপ্রভু চলিল নৃত্য করিতে করিতে।' শ্রীচৈতন্য "হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইল।" "হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন।" তারপর 'বালুকায় গর্ত করি তাহে শোয়াইল।' শ্রীচৈতন্য "আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তাঁর গায়।" তারপর মহোৎসবের জন্যে তিনি নিজেই ভিক্ষা করলেন। মহোৎসব হলো। ভক্ত-বৎসল শ্রীচৈতন্য ভক্তদের নিজের হাতেই পরিবেশন করলেন। "সব বৈষ্ণবের প্রভু বসাইল সারি সারি। আপনি পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি।।" মহাপ্রভুর 'শ্রীহস্তে অল্প নাহি আইসে। একক পাতে পঞ্চজনের ভক্ষ্য পরিবেশে।" এর মধ্য দিয়ে শ্রীচৈতন্যের যে ভক্ত-বাৎসল্য প্রকাশ পেয়েছে তা অনন্য, অতুলনীয়, অসাধারণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যথার্থই লিখেছেন-"শ্রীচৈতন্যসম আর কৃপালু বদান্য। ভক্ত-বৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য।"

**তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের অলৌকিকত্ব** **ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য**

কুষ্টিয়া জেলার পতিতোদ্ধারিণী পুণ্যতোয়া গড়াই নদীর তীরে পুণ্যধাম কুমারখালিতে ১৮৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। তাঁর অলৌকিক বিভূতির তুলনা নেই। তিনি এযুগে তন্ত্রের মাহাত্ম্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। হাইকোর্টের তদানীন্তন ইংরেজ বিচারপতি ব্যারিষ্টার স্যার জন্ উড্রফ এই তন্ত্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কিভাবে তন্ত্রাচার্যের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন সেই প্রসঙ্গে বসন্তকুমার পাল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব'-এ লিখেছেন। তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছিঃ '.....কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর শাস্ত্রী মহাশয়ের মাধ্যমে বিচারপতি বিভিন্ন সময়ে নানা শ্লোক ও কূট প্রশ্নের মীমাংসা চাহিয়া পাঠাইতেন। বিদ্যার্ণব মহোদয়ও সেই সব প্রশ্নাদির উত্তর সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া পাঠাইতেন। এইভাবে যতদিন যাইতে লাগিল প্রশ্নোত্তর ও মীমাংসা সমাধানের মধ্য দিয়া উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশঃ ঘনিষ্টতর হইতে লাগিল। ফলে এই সময় হইতেই যেন উড্রফ তন্ত্রোক্ত শক্তি-জননীকে স্বীয় হৃদয় কমলাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।'

বিচারপতি উড্রফের সহিত শিবচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎকালীন এক অত্যাশ্চর্য্য অভিজ্ঞতার কাহিনী পন্ডিত শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিদ্যার্ণব মহাশয়ের ভক্ত শিষ্য এবং সর্ব্বমঙ্গলা সভার সহকারী সম্পাদক ও অনুলেখক দানবারি গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখাৎ যাহা অবগত হইয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। বিচারপতি বলিতেছেন,'বিদ্যার্ণব মহাশয়ের বাসস্থানের চতুঃসীমায় পদার্পণ করিবামাত্র তিনি যেন হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ কিছু অনুভব করিলেন। কি এক তীব্র প্রবাহ দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে থাকে। বোধ হইতেছিল যেন সমগ্র বিশ্ব চক্রাকারে ঘুর্ণিত আবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে- মনের ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে- বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে শুভ্র এক বিদ্যুৎবর্ণ রেখাঙ্কিত প্রণব (ওঁঙ্কার) মধ্যে মায়াবীজ সমন্বিত মাতৃবীজ মন্ত্ররাশি আমার চোখের সামনে সমুদ্ভাসিত হইয়া চতুর্দিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। বাক্ ও চলচ্ছক্তিহীন দণ্ডায়মান রহিলাম। পরে বিদ্যার্ণব মহোদয়েরই ইঙ্গিতে বোধহয় শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে ধরিয়া আসনে বসাইয়া দিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়কে এর কারণ সম্পর্কে বিচারপতি জিজ্ঞাসা করেন- পণ্ডিতজী, বিদ্যার্ণবের সহিত সাক্ষাৎ করার পূর্বে তো আমি সুস্থই ছিলাম। তবে হঠাৎ আমার দেহে এই অত্যদ্ভুত অবস্থান্তর ঘটিল কেন? বিদ্যার্ণব মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করার সময় তাঁহার প্রতি আমি মনে মনে চুম্বকাকর্ষণ অনুভব করিতেছি। তাঁহার তেজপূর্ণ মুখমণ্ডল আমার মনশ্চক্ষে সদা জাগরুক রহিয়াছে।

এই সময় হইতে বিচারপতি উড্রফ বিদ্যার্ণবকে কলিকাতা আসিলে নিজের বাড়ীতে নিয়া আসিতেন এবং সাধনার-বিশেষত শক্তি-সাধনার বিবিধ ধারা পদ্ধতি বিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে ব্যাখ্যান ও নিগূঢ়তত্ব অবগত হইতেন।

ইতিমধ্যে বিচারপতি উড্রফের জীবনে একটা আমূল পরিবর্তনকারী ঘটনা ঘটিয়া গেল। তিনি বিদ্যার্ণব মহাশয়ের কাশীধামে প্রদত্ত উপদেশ স্মরণে রাখিয়া তদনুযায়ী ভারতীয় সিদ্ধ যোগীগণের সহিত সাক্ষাৎ তাঁহাদের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাদের সহিত তত্ত্ববিষয়ক, প্রসঙ্গক্রমে গুরুমুখী ভারতীয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিবার মানসে ঐ সকল মহাযোগী মহর্ষিগণের সন্ধান পাইবার উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্নাঞ্চলে সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া দিলেন। তাঁহার এক সংবাদদাতার নিকট হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্যার জন্ তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের সকল সময়ে সাহায্য ও যোগাযোগকারী কলিকাতা হাইকোর্টের দোভাষী সুপন্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী এবং আরও কয়েকজন অনুরাগী সহ হরিদ্বার অভিমুখে রওয়ানা হইয়া যান। এখানে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী এক বর্ষীয়ান

মহাতপা সিদ্ধ মহাত্মার দর্শন পান। মহাত্মার প্রতি যথাবিহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্ব্বক তিনি অধ্যাত্ম তত্ব সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্য তাহার নিকট প্রার্থনা জানান। এই তত্বালোচনাকালে মহাত্মার বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য্যাদির পরিচয় পাইয়া বিচারপতি মহাত্মার প্রতি এতটা আকৃষ্ট ও আসক্ত হইয়া পড়েন যে তিনি যোগীবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। সাধকপ্রবর তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া উপদেশচ্ছলে বলেন, "হে সুধি, আপনি আমাদের ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ব সম্বন্ধে এত আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু দেখিয়া আমি খুবই আনন্দিত ও প্রীত। কিন্তু আপনার গুরু আমি নহি। এক সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী জ্ঞানী ও উগ্রকর্ম্মী সাধক গুরু তো আপনার গৃহ সন্নিকটেই রহিয়াছেন। এই পণ্ডিতের বহির্ব্বাস সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় না হইলেও তিনি একাধারে জ্ঞানী ও যোগী এবং সিদ্ধ সাধক। তাঁহাকে আপনি সাধারণ লোক ভাবিবেন না। তিনি সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। মনে এ সম্বন্ধে কোন সংশয় রাখিবেন না। ফিরিয়া যান গৃহাভিমুখে। অবিলম্বে তাঁহার শরণাগত হউন। কামনা করি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।"

'এ বিষয়ে তাঁবুতে ফিরিয়ে আসিয়া বিচারপতি সঙ্গীগণের সহিত আলোচনা করেন। বিচারপতি ভাবেন, কিভাবে এই নির্দ্দেশিত পণ্ডিত আমার পূর্ব্ব নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক জীবনের গুরু হইতে পারেন? এই চিন্তা তাঁহার সমস্ত হৃদয়মন সারাক্ষণ তোলপাড় করিয়া ফেলিতেছিল। বহু চিন্তার পরও বিচারপতি এ বিষয়ে কোন যুক্তিনিষ্ঠ সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না।'.....(তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব-শ্রীবসন্ত কুমার পাল-পৃঃ ৫৭-৫৯)

উক্ত গ্রন্থের অন্য এক স্থানে বসন্ত কুমার লিখেছেন,

'.....অতঃপর গুরুপ্রাণ বিচারপতি উদ্ভ্রফ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শিবচন্দ্রের যোগশক্তি সম্পর্কিত কতিপয় অলৌকিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেনঃ 'গুরুদেব দেহরক্ষার বিষয় যেন পূর্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইদানীং তিনি অনেক সময়ই আমায় বলিতেন যে, তাঁহার দেহরক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং গুরুতত্ব ও সাধন রহস্য এবং হিন্দুধর্মের অন্যান্য তত্বাদি সম্বন্ধে কিছু বুঝা বা জানিবার প্রয়োজন বোধ করিল তদ্বিষয়ক সকল পরিপ্রশ্ন পরিষ্কার করিয়া যেন জানিয়া বা বুঝিয়া লই। এতদনুসারে আমার জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমুদয় প্রশ্নাদির সুন্দর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া সমাধান করিয়া দিতে লাগিলেন। মনে আছে, একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তত্ববিষয়ক কোনও সমস্যার সম্মুখীন হইলে তদ্বিষয়ে আলোক পাওয়ার জন্য আপনি কাহার সমীপস্থ হইতে উপদেশ করেন? বিদ্যার্ণব মহাশয়

খানিকক্ষণ নীরব রহিয়া মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "আমার চোখে তো এই মাতৃতত্ব ও অন্যান্য তত্বাদি সম্পর্কে প্রকৃত অধিকারী ব্যক্তি এতদঞ্চলে দেখিতে পাইতেছি না। –হাঁ, ভাল কথা মনে পড়িয়াছে। জ্ঞান ও সাধনা সম্পর্কিত জটিল সমস্যা সমাধান লাভের জন্য আপনি স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী মহারাজের সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন। তিনি আপনার ন্যায় জ্ঞানাশ্রয়ী তত্বানুসন্ধানী মনের প্রশ্ন সমূহের সন্দেহ নিরশনকারী যুক্তি তর্ক ও প্রমাণ দ্বারা দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদক সন্তোষজনক সমাধান করিয়া দিতে সক্ষম।"

বিচারপতি ও অপরাপর বক্তাগণের নিজ নিজ জীবনে বিদ্যার্ণব-এর অলৌকিক কাহিনী বিবৃত করিবার পর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রী ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় সুদূর কার্যস্থল হইতে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত হইতে না পারিয়া আন্তরিক দুঃখ প্রকাশপূর্বক বিচারপতি উড্রফের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন, উহাতে তাঁহার জীবনের সহিত শিবচন্দ্রের সম্পর্কের একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠান। এবং তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ জানান যে উক্ত কাহিনীটি যেন উপস্থিত সুধী ভক্তবৃন্দের নিকট পঠিত হয়। পত্র লেখকের এই অনুরোধ প্রতিপালিত হয়। ঐ লিখিত বিবরণটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পণ্ডিত বিদ্যার্ণবের ভক্ত শিষ্য দানবারি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দিনলিপি হইতে পত্রের প্রসঙ্গোচিত অংশসমূহ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। "আমি যখন কার্য্যোপলক্ষে ইংরেজী ১৯০৮\৯ সালে কালনা মহকুমায় থাকি, তখন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ঠাকুরের সহিত আলাপের সুযোগ হয়। আদালত বন্ধের সময়ে কাশীধামে আসিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করি। আমি তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলে এবং ক্রমশঃ দেখা সাক্ষাৎ করিতে থাকিলে তিনি আমাকে স্নেহ চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্মভাব, পূজা এবং জগদম্বার উপর নির্ভরতা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তির চক্ষেই দেখিতে লাগিলাম। ভক্তের মুখনিঃসৃত ভক্তিকথা বড়ই মধুর লাগিত। একদা তাঁহার সহিত ভ্রমণ উপলক্ষ্যে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে তুলসীদাসের গুরুলাভ এবং সাধনার কথা শুনিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। কাশীধাম হইতে অবকাশ শেষে চলিয়া যাইবার সময় বিদ্যার্ণব ঠাকুরের প্রতি আমার মন পূর্ণভাবেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। এখন আমার মনে এরূপ ইচ্ছা হইল যে তাঁহারই নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া উপদেশ প্রাপ্ত হই।"

"অল্পদিন পরেই আমি কালনা হইতে পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার সদর কুমিল্লায় কার্য্যোপলক্ষে বদলি হইয়া যাই। সেখান হইতে বিদ্যার্ণব মহাশয়কে পত্র

লিখিয়া স্থির করি যে, তাঁহার নিকটেই উপদেশ লইব। তিনিও তাহাতে সম্মত হন, কেবল সুবিধাজনক সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলাম।"

"আমার এই কার্য্যস্থলে একাকী অবস্থান সময়ে কিম্বা চলাকালে একটা অজানিত ভীষণ ভয় আমার দেহমনকে অসাড় করিয়া দিত। সর্বদা এইরূপ ভীতার্ত্ত মানসিক অবস্থার ফলে আমার দৈহিক ও মানসিক অবস্থার খুবই অবনতি ঘটিল। এই মানসিক বিপর্য্যয়কর অবস্থার কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বিদ্যার্ণব মহাশয়কে পত্র দি। বিদ্যার্ণব মহাশয় পত্রের উত্তরে আমাকে উপদেশ এবং মনোবল ও সাহস দিয়া এক পত্র দিলেন। তিনি লিখিলেন– 'আপনি শক্তি সাধনা করিতে অভিলাষী। এইরূপ দুর্বল মনোবল লইয়া কি শক্তি সাধনা করিতে চাহিতেছেন? শক্তিমান না হইলে শক্তি সাধনার অধিকার জন্মায় না। কাজে কাজেই সকল প্রকার মানসিক ভয়ডর ও জড়তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দূর করিয়া দিন। আপনি আপনার লিখিত এই সকল বিষয় ভাবিয়া মনকে অযথা দুর্বল করিবেন না। তবে ইহা জানিয়া রাখুন যে, জগদম্বা যখন যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্যেই করেন। অতএব এটাও জানিয়া রাখুন যে এই প্রকার নিঃসহায় অবস্থা পরম মঙ্গলপ্রদ। আমরা যদি নিজেদের শক্তিহীনতার কথা বুঝিতে পারি এবং সম্পূর্ণরূপে নিঃসহায় বোধ করি তাহা হইলে সেই সময় আমরা ভগবানকে ডাকিতে থাকি। সেই নিরুপায় অবস্থায় আমাদের ভগবানের প্রার্থনা প্রকৃত আন্তরিক প্রার্থনায় পরিণত হয়। আন্তরিকভাবে আর্ত্তি তাঁহাকে জানাইতে পারিলে তিনি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। আপনার প্রতি এই উপদেশ যে আপনি অনতিবিলম্বে কোন সদ্‌গুরুর নিকট হইতে ব্রহ্ম মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করুন। ইহাতে আপনার সকল প্রকার অনাগত অমঙ্গল দূরীভূত হইয়া যাইবে এবং আপনার সর্বদিকে মঙ্গল হইবে। আপনি আমার নিকটে দীক্ষা গ্রহণের জন্য সুদূর কার্য্যস্থল হইতে সুবিধাজনক সময়ের অপেক্ষায় রহিয়াছেন। ছুটির বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই আপনি আসিয়া আমার নিকট হইতে পূর্ব বন্দোবস্তানুযায়ী প্রার্থিত দীক্ষা গ্রহণ করিবেন লিখিয়াছেন। কিন্তু আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থায় আমার উপদেশ এই যে, আপনি ছুটির সেই অনিশ্চিত সুবিধাজনক সময়ের অপেক্ষায় না থাকিয়া অনতিবিলম্বে আপনার ওই অঞ্চলের সত্যিকারের কোন সাধকের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করুন। এইরূপ একটি গৃহী সাধকের সন্ধান ও নাম আপনাকে এই পত্রে লিখলাম। তিনি শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বেগমপুরের অধিবাসী। নাম তাঁর শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী। তিনি সুশিক্ষিত ও বিদ্বান এবং গুপ্ত সাধক। যেই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া আপনি আমার নিকট হইতে উপদেশ ও দীক্ষাশ্রয় লওয়ার

জন্য মনস্থ করিয়াছিলেন, যে বিশ্বাসের ও নির্ভরতার বশবর্তী হইয়া আজ আমাকে আপনার নিরুপায় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় বর্তমান সঙ্কটপূর্ণ মানসিক অবস্থার কথা লিখিয়া উপদেশ চাহিয়াছেন সেমতে আমি পুনরায় আপনাকে এই পরম হিতকর উপদেশ ও নির্দেশ দিতেছি যে আপনি আর কালবিলম্ব না করিয়া আমার নির্দ্দেশিত ও চিহ্নিত সাধকের নিকট হইতেই দীক্ষা গ্রহণ করুন। ইহাতে আপনার সর্বদিকে মঙ্গল হইবে। সদ্‌গুরু সকলেই এক জানিবেন। আমার বহু আকাঙ্খিত এই গুরুটি যেন আমার মঙ্গলের জন্যই তাঁহার যোগশক্তি বলে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেন। বিদ্যার্ণবের নির্দ্ধারিত প্রস্তাবিত গুরুর সহিত যোগাযোগের ব্যবস্থাও বোধ করি পূর্বাহ্নেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিদ্যার্ণবের মহাশয়ের পত্র পাওয়ার দুই একদিনের মধ্যেই ভুলুয়াবাবা(কালীদাস ঘোষ) পূর্ব পরিচয় সূত্রে হঠাৎ আসিয়া আমার কুমিল্লার বাসায় উপস্থিত হইলেন। কথা প্রসঙ্গে তাঁহার নিকট আমার অসহায় অবস্থার কথা এবং বিদ্যার্ণব মহাশয়ের পত্রের মর্ম্ম ও প্রস্তাব সবই ব্যক্ত করি। ভুলুয়াবাবা বলিলেন, বিদ্যার্ণব মহোদয়ের সহিত আমার বিশেষ আলাপ আছে। তাহার ন্যায় সিদ্ধ মহাযোগী যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা অতি অবশ্য বিনাবিচারে শিরোধার্য্য করিয়া পালনীয়। তাঁহার (মাতৃসাধক শরচ্চন্দ্র) সম্বন্ধে বিদ্যার্ণব যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। এই অঞ্চলে আপনি নূতন। সুতরাং শরচ্চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকারের সমুদয় ব্যবস্থা আমিই করিয়া দিতেছি। "ভুলুয়া বাবা" পত্রদ্বারা সাধক শরচ্চন্দ্রকে কুমিল্লায় আমার বাসায় আনিয়া উপস্থিত করিয়া দিলেন এবং আমায় দীক্ষা সংক্রান্ত সমুদয় ঘটনা ও বিদ্যার্ণবের প্রস্তাব ও নির্দ্দেশ এবং তাঁহার নিকট আমার দীক্ষালাভের প্রার্থনা শুনিয়া বাড়ী যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন যে তিনি বাড়ী গিয়া এই বিষয়ে পাকাপাকি পত্রদ্বারা জানাইয়া দিবেন।

অতঃপর তিনি বেগমপুরের বাড়ী গিয়া পত্রদ্বারা দীক্ষার দিন ও সময় স্থির করিয়া আমাকে পত্র দ্বারা জানাইয়া দেন এবং যথা নির্দিষ্ট তারিখে স্বয়ং কুমিল্লায় আসিয়া ধার্য সময়ে শুভ দীক্ষাদান কার্য সুসম্পন্ন করিলেন। ভাবিয়া বিস্মিত হই যে বিদ্যার্ণব মহাশয় কি বিরাট মহদন্তঃকরণ বিশিষ্ট লোকোত্তর চরিত্র মহাপুরুষ ছিলেন। এইরূপ আচরণ তো ব্যবহারিক জগতে দেখা যায় না। আমার এই দুর্দশাগ্রস্ত বিপন্ন মানসিক অবস্থা ভাবিয়া ধর্ম ব্যবসায়ী গুরু তো তাঁহার নিকট হইতেই দীক্ষা গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা ও উপদেশ দিতেন। বিদ্যার্ণব মহাশয় মনে হয় আমার তৎকালীন শরীর এবং মনের অবস্থা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াই আমার কার্যস্থল হইতে এত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিবার খুব

অসুবিধা এবং শারীরিক মানসিক ঐরূপ বিপর্যয়কর অবস্থায় এই দীর্ঘপথ আসিতে পথিমধ্যে কোন দুর্ঘটনা সংঘটনের বিপদাশঙ্কার বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার কার্যস্থলের নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ঋষিকল্প গুরুর সন্ধান ও নির্দেশ দান করিয়া আমায় অধ্যাত্ম জীবনের সর্বনাশ হইতে পরিত্রাতারূপে রক্ষা করিলেন। যুগাচার্য মহামানব মহাত্মাগণের নিকট ভিন্ন অপরের নিকট এরূপ নিঃস্বার্থ উদার ও হিতকারী ব্যবহার আশা করা যায় না। সাধারণতঃ সংসারী ধর্ম-ব্যবসায়ী ও মঠাদির অধ্যক্ষগণ যেমন মোটা বেতনের বড় পদস্থ সরকারী চাকুরিয়া অথবা ধনী শিষ্য করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন বিদ্যার্ণবের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেল।

হইবে না কেন? তিনি তো আর সাধারণ মানুষ নহেন- মহাত্মারাই মহৎ প্রাণের ব্যবহার ও পরিচয় দেখাইতে পারেন। সাধক ভিন্ন সাধক-জীবনের রহস্যোদ্ঘাটন করা কখনও সম্ভব নহে। কোটি সূর্যসম প্রখর যোগৈশ্বর্য ও বিভূতি শক্তির আধার শিবচন্দ্রের ন্যায় সিদ্ধ মহাত্মার জীবন বুঝিতে পারা বা আলোচনা করা আমার ন্যায় সাধনবিহীন অকিঞ্চনের পক্ষেও সেইজন্য সম্ভব নহে। কারণ সিদ্ধ মহাত্মা মহর্ষিগণের জীবনের গভীরতা অনির্ণেয় অগাধ অতল সীমাহীন বিশাল মহাসাগর সদৃশ!’

“একমাত্র সেই কর্মই অধ্যাত্ম পরিশুদ্ধি আনয়ন করিতে পারে যাহা কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য লইয়া করা হয় না- যাহা যশ, লোক-প্রশংসা বা সাংসারিক মহত্ত্বের বাসনা লইয়া করা হয় না। যাহা আপন মানসিক কোন অভিপ্রায় বা প্রাণের কামনা বা দাবি বা দৈহিক অভিরুচির উপর জোর দিয়া করা হয় না। যাহা মিথ্যা গর্ব বা রূঢ় আত্ম প্রতিষ্ঠা অথবা পদ ও মর্য্যাদার দাবি লইয়া করা হয় না। পরন্তু একমাত্র ভগবানের জন্য এবং ভগবানেরই আদেশে করা হয়। অহঙ্কৃত ভাব লইয়া যে সমস্ত কাজ করা হয়, অজ্ঞানময় জগতের লোকের পক্ষে যতই কল্যাণকর হউক না কেন, যোগ সাধকের কোন উপকারেই তাহা আসে না।”

----- শ্রী অরবিন্দ

DO NOT COPY

## পাসওয়ার্ড

শ্রী দীপঙ্কর নন্দী

জীবনের সবকিছু এখন গোপন তথ্যের
পাসওয়ার্ডে আটকা পড়ে গেছে –
দরজায়, সিন্দুকে, দেরাজে, দোকানে, বাজারে
প্রবেশের ছাড়পত্র অক্ষর ও সংখ্যায়
সারবন্দী হয়ে আছে মুঠোফোনে, কার্ডে
কম্পিউটারে –
গোপন তথ্যের অগণিত সংখ্যা ও অক্ষর
নানা বিন্যাসে দ্বাররক্ষী হয়ে অনন্ত পাহারায়,
তথ্য বিনিময়ের সাবধানবাণী বিপদসঙ্কেত
জানিয়ে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত
কম্পিউটারে, মুঠোফোনে, দূরবার্তায়,
গোপন থামে, আলাপচারিতায়,
হারিয়ে যাচ্ছে বৃষ্টিহীন ভোর, উদাসী দুপুর –
সন্ধ্যাতারার আলো মেখে ফুরিয়ে যাচ্ছে রাত,
অন্তহীন চাহিদায় পৃথিবী উষ্ণ হলে
অভিমান গাঢ় হয় –
স্বাচ্ছন্দ্য বিলাসে ঢেকে যায়
সমস্ত অভিমান, অনুভূতি।

## মনের পূজা

স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ

গানের অর্ঘ্য দিয়ে করি যে স্মরণ,
হিয়ার কুসুম দিয়ে করি গো পূজন,
অজ্ঞতার ঘুমে যদি থাকি অচেতন
তোমার কৃপায় যেন ভাঙে গো স্বপন।
ছন্দের আবীর দিয়ে তোমায় রাঙ্গাবো,
কল্পনার চন্দন দিয়ে চরণ সাজাবো,
তুমি পূর্ণ কর মোর হৃদ-সিংহাসন,
সুরের নীরব পূজা জানবেনা ত্রিভুবন।

DO NOT COPY

## পিতা নো বোধি

সুনন্দন ঘোষ

আমি তোমাকে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরতে চাইছিলাম।
তোমার চিতার ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠছিল,
নিমগাছে ঝাপটা দিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল গঙ্গার বুকে –
ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল চারদিক –
চারপাশের চেনা মানুষগুলোও ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল
আমার চোখের জলে।
আমি তোমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে কাঁদতে চাইছিলাম।

অনেক বড় ছিল পরের রাত্রিগুলো।
নতুন রাত্রি – নতুন ভয় – নতুন অসহায়তা!
হঠাৎ একদিন আয়নার সামনে দাঁড়ালাম।
দেখলাম নিজেকে, দেখলাম তোমায়,
দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে রেখেছো
বুকের ভিতর – সেই ছোট্টবেলার মত।

আর ভয় করে না।

তোমার পার্থসারথি এখন আমাদের পার্থসারথি।
অনেক তার বায়না।
আগে প্রতিদিন ভাবতাম
এই বছরটাই শেষ --- আর টানা যাচ্ছে না।

কে যে আমায় টেনে রেখেছে এই ছত্রিশ বছর!
এখন বুঝি –
তার শুরু আমার হাতে ছিল না –
তার শেষ থাকবে তার নিজেরই হাতে।

আমি খুদাই খিদমদগার!

DO NOT COPY

## আমাদের কথা

পার্থসারথি অন্তর্জাল সংখ্যা দু'বছর বয়স পূর্ণ করে এই সংখ্যায় তৃতীয় বছরে পা রাখলো। মনে পড়ে যাচ্ছে পুরনো কিছু কথা।

২৭ শে জানুয়ারী, ২০২০ তে কেরালায় অনুভূত হোল কোভিড-১৯ এর ঝটকা। সংক্রমণ দ্রুত ছড়াতে শুরু করল দেশজুড়ে।

২২শে মার্চ, ২০২০ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন "জনতা কার্ফু"। অনতিবিলম্বে সারা দেশে ঘোষিত হল লকডাউন। নাগরিক জীবনে সূচনা হল এক অকল্পনীয় ভয়াবহ অধ্যায়ের। জনহীন রাস্তাঘাট, নিষিদ্ধ যান চলাচল, বন্ধ অফিস, কোর্ট, স্কুল কলেজ, লাইব্রেরী, দেবালয়, প্রার্থনা-গৃহ। বন্ধ বিনোদন – প্রেক্ষাগৃহ, মিলন মেলা। বন্ধ সিনেমা-সিরিয়ালের নির্মাণ। মাইলের পর মাইল নামানো সাধারণ দোকানের ঝাঁপ। মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমী ওষুধের দোকান, কিছু মুদীখানা, মিষ্টির দোকান। মাছের বাজার, ফল সব্জী ডিম দুধ, সর্বত্র লাইন আর লাইন। মাস্ক, স্যানিটাইজার, সেফ ডিস্টেন্সিং, পিপিই, আসিম্পটোমেটিক, কন্টেইনমেন্ট জোন, পালস অক্সিমিটার- কত নতুন শব্দ সম্ভার, নতুন অভ্যাস।

উদ্ভ্রান্ত মানুষ। অভিমন্যুর মত চক্রব্যূহে বদ্ধ। চারদিকে সংক্রমণের নিত্য নতুন প্রচার, বিশ্লেষন। প্রতিদিন চেনা অচেনা মানুষের মৃত্যুর খবর। সংক্রমণের ভয়ে ডাক্তাররা বসছেন না চেম্বারে। অতি পরিচিত ডাক্তাররাও ক্রেতা সুরক্ষার বেড়াজালে আটকে ফোনে দাওয়াই দিতে বিমুখ। টিভি আর সংবাদপত্রের সৌজন্যে বেসরকারী হাসপাতাল মানেই অর্থনৈতিক বধ্যভূমি।

দূর দূরান্তর থেকে অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে ঘরে ফিরেছেন পরিযায়ী শ্রমিকেরা। পথেই ঝরে গেছে বেশ কিছু প্রাণ। ভিন-রাজ্য থেকে ফিরে নিজের ঘরে ঢোকার অনুমতি পান নি বহু দরিদ্র মানুষ। তাঁবুতে, নৌকোয়, পরিত্যক্ত বাড়িতে কোয়ারেনটাইন জীবন কাটিয়েছেন তাঁরা। কোভিড যোদ্ধারা সেবা-কাজের শেষে বাড়িতে ঢুকতে পারেন নি কিছু অতি-সক্রিয় প্রতিবেশীর বাধায়।

অভাবনীয় আতঙ্ক আর অবিশ্বাসের বাতাবরণে ঘরের দরজা থেকে কথার পাট চুকিয়ে ফিরে যেত আত্মীয় স্বজন বাল্য-বন্ধু। ভীড়ের মধ্যে একটা কাশির শব্দ হলে ত্রস্ত চোখে সবাই উৎস খুঁজত।

করোনার প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ... একের পর এক ঢেউয়ে ডুবেছে ভারতের মানুষ, আবার ভেসে উঠেছে। গর্বিত উন্নত দেশ, যারা ভারতীয় উপমহাদেশে পথে ঘাটে মৃতদেহের স্তূপ দেখার ভবিষ্যৎবাণী করেছিল, তারা

নিজেরাই হারালো লক্ষ লক্ষ মানব-সম্পদ। আর আমাদের এই জনবহুল দেশে যেখানে সর্বক্ষেত্রে বিপুল বৈপরীত্য, সমাজের উচ্চস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি, হীনবল মানুষদের প্রতি অবজ্ঞা, বিশ্বব্যাপী হাহাকারের মধ্যে মুষ্টিমেয় লোকের মুনাফা লোটার নগ্ন প্রতিযোগিতা, সেখানেই শৃঙ্খলা আর দায়বদ্ধতার নজির সৃষ্টি করে মানবতার ধ্বজা তুললো ভারতের কোটি কোটি দরিদ্র অসাধারণ মানুষ। কঠোর সামাজিক বন্ধন, অনুশাসন, বৈজ্ঞানিক ঔৎকর্ষ, দেশপ্রেম, দেশের মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা – সব কিছুর যোগফল ভারতের সফল কোভিড-যুদ্ধ।

পার্থসারথি ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকার মুদ্রিত সংখ্যার প্রকাশ শুরু ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৩ই মার্চ, ২০২০ জিপিও-তে শেষবার পোস্ট হল পার্থসারথির মুদ্রিত সংখ্যা।

শেষ বার, কারণ আচমকা লকডাউনে সব ছাপাখানা বন্ধ হয়ে গেলো। বই কে কম্পোজ করবে? কে ছাপাবে? কে বাইণ্ডিং করবে? কি করে পোস্ট হবে?

"যথা ধর্ম তথা জয়।" পত্রিকার লক্ষ্য আর আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে পরের মাসেই অর্থাৎ ২৪শে এপ্রিল, ২০২০-তে পার্থসারথির নিজস্ব ওয়েবসাইটে নবরূপে প্রকাশিত হল পার্থসারথি পত্রিকা। ই-ম্যাগাজিন ... অন্তর্জাল সংখ্যা। ২৪শে এপ্রিল কেন? শ্রী অরবিন্দের অনুগামীদের কাছে ২৪শে এপ্রিল বিশেষ দিন ... শ্রীঅরবিন্দকে দর্শনের দিন। এই পত্রিকার সংগঠকদের কাছেও ২৪ তারিখের ব্যক্তিগত তাৎপর্য অপরিসীম।

সব কাজেরই পক্ষে বিপক্ষে মতামত থাকে। যাঁরা ছাপার বই পড়তে অভ্যস্ত, বিশেষত প্রবীণেরা, তাঁরা অনেকে মোবাইল বা কম্পিউটারে বই পড়তে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না। আবার আধুনিক প্রজন্ম ই-বুক পাঠে পারদর্শী। তারা এখন কৌতূহলে স্ক্রল করছে পত্রিকার পাতা। মতামতও দিচ্ছে একান্তে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বইয়ের পিডিএফ কপি সেকেণ্ডে পৌঁছে যাচ্ছে দেশে বিদেশে।

কৃতজ্ঞতা জানাই সোমা (ঘোষ)কে। এই বইকে প্রতিমাসে রূপ দেওয়ার জন্য তার পরিশ্রম অকল্পনীয়। পত্রিকার রূপসজ্জাকে নিখুঁত করার জন্য মানব আদিত্যের মূল্যবান মতামত, নতুন ফরম্যাট তৈরিতে পার্থ কুণ্ডুর সহায়তা-- সবই মনে আছে। সবাই অন্তর থেকে ভালবাসে শ্রীপ্রীতিকুমারকে, ভালবাসে পার্থসারথিকে। সবাইকে নিয়ে পার্থসারথির জয়যাত্রা অনিবার হোক।

জয়তু শ্রীপ্রীতিকুমার !!!  জয়তু পার্থসারথি !!!